একুশ থেকে একাত্তর

একুশ থেকে একাত্তর

আহমদ রফিক

অনিন্দ্য প্রকাশ

অনিন্দ্য প্রকাশ-এর প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৪৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০১৫

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২২২৬৬৩৭৯৯৬, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
৪০/১, মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১৩৬২
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
প্রণব রায়

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা

Eqush Theke Ekattor by **Ahmad Rafique**
Published by Md. Afzal Hossain

Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 02226637996, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : September 2023

Price : 500.00
US $ 10

ISBN 978 984 97409 7 1

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪
https://www.prothoma.com/publisher/অনিন্দ্য-প্রকাশ ফোনে অর্ডার করতে ০১৯৮৮৩৩৭৭৩৩

হিরু

উপহারের বইতে শৈশবস্মৃতির কথা লিখেছ
এ বইতে আছে একুশ ও একাত্তরের বিচার-ব্যাখ্যা
প্রীতি ও শুভেচ্ছা

ভূমিকা

আমরা জানি, পূর্ববঙ্গে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে বাঙালি জাতীয়তাবোধের যাত্রা ও ক্রমবিকাশ পুরো ষাটের দশকজুড়ে। স্বশাসন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি আন্দোলনের ধারায় অবশেষে একাত্তরের রণাঙ্গনে। সেখানে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জয়-পরাজয় নিশ্চিত হয়, অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। যার সূচনা সেক্যুলার জাতিরাষ্ট্র হিসেবে।

এমন সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও উঠতি বিত্তবানদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে এবং ঘটছে, যা এখন ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। অভিযোগ অনেকের, সমাজ নিরীক্ষায় অর্থনৈতিক সূচকে উন্নতি সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধে আকাঙ্ক্ষিত সর্বজনীন স্বার্থের পূরণ অনেকটাই অধরা রয়ে গেছে। এমনকি রাষ্ট্রিক সামাজিক সেক্যুলারিজম এখন প্রশ্নের সম্মুখীন। প্রশ্ন প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধান নিয়ে।

তাই শুরু হয়েছে ভাষা আন্দোলন, বিশেষ করে একুশে এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নানামাত্রিক বিচার-বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন, দুর্বলতা-সবলতার দিক নিয়ে। সেইসঙ্গে সাহিত্যে-রাজনীতিতে একুশের অবদান নিয়ে। সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা চলছে একুশের অবদান এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তার আত্যন্তিক সম্পর্ক নিয়ে।

বিশেষত এ কারণে যে পাকিস্তানি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদী যাত্রা কোথায়, কীভাবে শুরু হয়ে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছিল এবং তার তাৎপর্যই-বা কী ছিল। কেন একটি শুভসূচনা সত্ত্বেও আমরা সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে এক অনাকাঙ্ক্ষিত বিন্দুতে এসে পৌঁছেছি, কেন ঘোষিত দাবি অধরা থেকে গেল, কেন অর্জনে বিচ্যুতি ঘটে গেল, কেন রাষ্ট্র তার আদর্শবিন্দু থেকে সরে গেছে।

এইসব প্রশ্নের জবাব খোঁজার চেষ্টা রয়েছে গ্রন্থে ধৃত বিচ্ছিন্ন রচনাগুলোতে, যা একুশে ও একাত্তরে দ্বিভাজিত। এই দুইকে নিয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা। কারণ একুশ ও একাত্তরের অনিবার্য যোগসূত্র তো অনস্বীকার্য। *একুশ থেকে একাত্তর* সংকলনগ্রন্থটি প্রকাশের জন্য অনিন্দ্য প্রকাশকে ধন্যবাদ।

আহমদ রফিক

সূচিপত্র

অমর একুশের ইতি-নেতির পাঁচকাহন ১১
অভিজ্ঞতার নানা আলোয় ভাষা আন্দোলন ১৯
ভাষা আন্দোলনে মেডিক্যাল ছাত্রসমাজ : ঐতিহ্যে, সংগ্রামে ২৭
অসম্পূর্ণ একুশের ট্র্যাজিক ইতিহাস ৩৫
ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস-বিকৃতি ৩৯
ভাষা আন্দোলনের অর্জন ও বিসর্জন ৪৫
ভাষা আন্দোলনের শ্রেণিচরিত্র ও তাৎপর্য বিচার ৫১
ইতিহাসের নির্মোহ বিচারে একুশে চেতনার প্রেক্ষাপট ও উত্তরভাষ্য ৬১
একুশের সমাজ-রাজনীতি : পূর্বাপর প্রেক্ষাপট ৬৮
'ভদ্রলোক-রাজনীতি' ও শ্রেণিচেতনার আলোকে ভাষা আন্দোলন ৭৭
একুশেচেতনা ও বাংলা ভাষার বর্তমান বাস্তবতা ৮৮
ভাষা ব্যবহারে স্ববিরোধিতা স্বাদেশিকতার পরিপন্থি ৯৫
ভাষা আন্দোলন ও আমাদের কবিতা ১০২
একুশের অবদান কতটা সাহিত্যে কতটা রাজনীতিতে ১০৯
একুশের ঐতিহ্য প্রভাতফেরি ফেরত চাই ১১৭
একাত্তর-মার্চ : যে স্মৃতি রক্ত ঝরায় ১২০
আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ : পূর্বাপর কথা ১২৯
একাত্তরের রাজনীতি ও মার্চের কিছু ঘটনা ১৩৯
সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর : স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিণাম ১৪৭
একাত্তর-মার্চের রাজনৈতিক পাঠ, পুনর্বিবেচনা ১৫৩
মুক্তিযুদ্ধ বনাম স্বাধীনতাযুদ্ধ : চরিত্রবিচার ১৫৮
ছাব্বিশে মার্চ : স্বাধীনতার চরিত্রচিত্র ১৬৭
স্বাধীনতার যাত্রা : পথের শেষ কোথায় ১৭২
স্বাধীনতা দিবস : ঐতিহ্যবিচার ১৭৭
জাতীয় চেতনা বনাম ইতিহাসচেতনা ১৮২
জাতীয়তাবাদী চেতনায় রাজনৈতিক স্ববিরোধিতা ১৮৬
একটু পা চালিয়ে, বিজয়কে ধরতে হবে ১৯৫
একটি অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ সমাপনের স্বপ্ন ২০১

অমর একুশের ইতি-নেতির পাঁচকাহন

শৈশবে মায়ের মুখ থেকে শুনে শুনে শিশু কথা বলতে শেখে। শুরু 'হয় মাতৃভাষা শেখার পাট। বড়ো হয়ে উঠতে উঠতে নানা সূত্রে ওই ভাষা শেখার কাজ চলতে থাকে। ভাববিনিময় থেকে শিক্ষা, সাহিত্যচর্চা ও জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মাতৃভাষা; রাজনীতিও ব্যতিক্রম নয়। ব্যক্তিজীবন ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে তৈরি হয় মাতৃভাষার শিকড়-ছোঁয়া সম্পর্ক। বিশ্বের দেশে দেশে মাতৃভাষা সর্বস্তরে শিক্ষার বাহন, হয়ে ওঠে জাতীয় ভাষা, রাষ্ট্রভাষা।

আমরা বাঙালি, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। ১৯৪৭ সালের আগস্টে শাসক ইংরেজ ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার সময় দেশটাকে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো রাষ্ট্রে (ডোমিনিয়নে) ভাগ করে দিয়ে যায়। এ বিভাগ ছিল ধর্মের ভিত্তিতে। পাকিস্তানে শাসকগোষ্ঠীর প্রধান অংশ ছিল ভারত থেকে আসা উর্দুভাষী মুসলমান এবং পাঞ্জাবি উচ্চবিত্ত শ্রেণি, আর কখনো পেছনে কখনো সামনে সামরিক বড়োকর্তাগণ (প্রধানত পাঞ্জাবি)। পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকশ্রেণি সংখ্যাগুরু বাঙালি জনগোষ্ঠীকে বরাবর অবজ্ঞার চোখে দেখেছে, প্রজা হিসেবে ভাবতে চেয়েছে।

কিন্তু ভোট-বিজয়ের (১৯৪৬) সমর্থনে পাওয়া পাকিস্তান নিয়ে বাঙালির বড়ো বেশি প্রত্যাশা ছিল, ছিল সর্বশ্রেণির মানুষের। জাতিচেতনা-শ্রেণিচেতনা সাময়িক ধামাচাপা পড়ে যায়। সম্প্রদায়-চেতনায় গড়া পাকিস্তানে বাঙালির প্রত্যাশার গায়ে চিড় ধরতে থাকে ওই সাতচল্লিশের শেষ দিক থেকেই। মূলত কিছুসংখ্যক তৃতীয় শ্রেণির সরকারি কর্মচারী ও ছাত্রদের সচেতন তৎপরতায়। এরপর ১৯৪৮-এর মার্চে সংঘটিত ভাষা আন্দোলন। কারণ একটাই, আর তা পাকিস্তানের শাসকদের ভ্রান্ত, অদূরদর্শী আচরণ, পূর্ববঙ্গকে উপনিবেশ বানানোর চেষ্টা। তার ভাষার অধিকার অস্বীকার করা।

সে ভুলের সূচনা উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার জবরদস্তিতে। এ চেষ্টার পরিণতিতে ১১ মার্চের পর বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন শুরু। শুরু ঢাকায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের ঘোষণায় যে 'উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হতে যাচ্ছে। এ ঘোষণায় ঢাকার ছাত্র এলাকায় জ্বলে ওঠে আগুন। শুরু হয় বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রকৃত লড়াই বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে।

শহর ঢাকা তখনো নগর বা মহানগরের মর্যাদা অর্জন করেনি। সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক চেতনায় সে তখনো খুব একটা অগ্রসর নয়। প্রচুর গাছগাছালির সবুজ এবং শিমুল-কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম পটভূমিতে ঘোড়ার গাড়ি, রিকশা, গোলগাল টাউন সার্ভিস বাস আর গুটিকয় মোটরগাড়ি নিয়ে মসজিদের শহর ঢাকার রাজনৈতিক চরিত্র তার উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মতোই। রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক তৎপরতা তখনো উচ্চগ্রামের নয়। এবং তা প্রধানত শিক্ষায়তন-কেন্দ্রিক।

যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জগন্নাথ বা ঢাকা কলেজ, মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল ইত্যাদি ঘিরে। ইডেন কলেজের স্বল্পসংখ্যক সাহসী ছাত্রী ভার্সিটির তেমনি কিছুসংখ্যক ছাত্রীর সঙ্গে রাজনীতির ডাকে সবে পথে নামতে শুরু করেছে, দ্বিধা-সংশয় তাদের বৃহত্তর সংখ্যকের মধ্যে। এ-অবস্থার মধ্যে মানতে হয় উজ্জ্বল ছাত্রছাত্রীদেরই ঝোঁক রাজনীতি ও সংস্কৃতিচর্চার দিকে। সে রাজনীতি গণতান্ত্রিক ও প্রগতিবাদী ধারার; কিন্তু তার অপরপিঠে পাকিস্তানবাদী বা ইসলামপন্থি ধারা। এই ত্রিধারার মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনের যাত্রা।

ভাষার সর্বজনীন চরিত্র তার আপন শক্তি নিয়ে সত্য। হয়তো তাই মাতৃভাষার ওপর আক্রমণের কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ সাময়িক একাট্টা হয়েছে। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবির পাশাপাশি থেকেই পাকিস্তানের সব প্রাদেশিক ভাষা, যেমন– পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বেলুচ, পশতুর পক্ষে রাষ্ট্রভাষার দাবি তুলেও আপস করতে হয়েছে অস্থানিক উর্দু ভাষার সঙ্গে। কারণ পশ্চিমের প্রদেশগুলোর পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সাড়া মেলেনি।

শুধু এ কারণেই নয়, শাসকগোষ্ঠীর অনমনীয় মনোভাব ও কৌশলগত কারণে স্লোগান দিতে হয়েছে 'উর্দুর সঙ্গে বিরোধ নাই' 'উর্দু বাংলা ভাই ভাই।' তবে পশ্চিমের প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের বিষয়টি তাদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টির ইতিবাচক তাত্ত্বিক ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে পাল্টা জোরদার স্লোগান ছিল– 'সর্বস্তরে বাংলা চালু করো', অর্থাৎ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে, শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের দাবি তোলা হয়, যা স্বাধীন বাংলাদেশে গত চল্লিশ বছরেও বাস্তবায়নের চেষ্টা চালানো হয়নি।

দুই

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক পূর্বোক্ত ঘোষণার (২৭ জানুয়ারি, ১৯৫২) পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র-যুবসমাজের তৎপরতায় একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রকাশ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন পরিচালনার

জন্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন (৩১ জানুয়ারি ১৯৫২), সভা-সমাবেশ-মিছিল এবং ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত ও প্রস্তুতি। ওই সিদ্ধান্ত বানচাল করতে ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ঢাকায় মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন প্রশাসনের ১৪৪ ধারা জারি। এ নিষেধাজ্ঞাকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পায় রাজনৈতিক কয়েকটি সংগঠন ও কিছুসংখ্যক ছাত্র-যুবনেতার আপসবাদী চরিত্র। অন্যদিকে এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক ছাত্র-যুবনেতা এবং সাধারণ ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভেঙে নির্ধারিত কর্মসূচি পালনের বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ঘটনা।

২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকে গোটা রাতটা ছিল ছাত্র ও রাজনীতিকদের জন্য আবেগ-উত্তেজনায় টানটান, সেই সঙ্গে ঘটনাবহুল। সে রাতে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আপসবাদী সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে আর্টস বিল্ডিং প্রাঙ্গণের আমতলায় ছাত্রসভায় ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত এবং তা বাস্তবায়নে ছাত্র-পুলিশ সংঘাত। শেষ পর্যন্ত মেডিক্যাল হোস্টেল প্রাঙ্গণে ও সামনের রাস্তায় পুলিশের গুলিবর্ষণে ছাত্র-অছাত্র হতাহতের ঘটনায় ২২ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত, পুরো পাঁচ দিন টানা হরতালে ঢাকা শহর অচল। ওই কয়েকটি দিন শহরবাসী চলেছেন ছাত্র-যুব নেতৃত্বের নির্ধারিত কর্মসূচিমাফিক। শহর ঢাকা তখন মুক্ত এলাকা। আন্দোলন চলেছে গোটা দেশজুড়ে। ছাত্রাবাস থেকে মাইকে পরদিনের নিয়মিত কর্মসূচি প্রচার করা হয়েছে আর পথচারী মানুষ দাঁড়িয়ে তা শুনেছেন। কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ নুরুল আমিন প্রশাসন ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে রাস্তায় সশস্ত্র পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী (ইপিআর) নামিয়ে রাতে কারফিউ জারি করেও অবস্থা আয়ত্তে আনতে পারেনি। ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশ ও সেনা জওয়ানদের গুলিতে হতাহত হন অনেকে।

ঢাকা ওই কয়েকটা দিন হয়ে ওঠে শোকের ও প্রতিবাদের শহর– মিছিলের শহর। পোস্টারে ফেস্টুনে লাল বর্ণমালায় চিত্রিত শহর। সেইসঙ্গে বাড়িতে বাড়িতে উড়ছে কালো পতাকা, রাস্তায় মিছিলে প্রতিটি মানুষের বাহুতে বাঁধা কালো ফিতা বা বুকে আঁটা কালো ব্যাজ। লাল-কালোর অদ্ভুত সমন্বয়। দেশের সর্বত্র শহরে-গঞ্জে চলছে সভা-সমাবেশ, মিছিল-স্লোগানের প্রতিবাদ।

এর মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 'শহিদ স্মৃতি অমর হোক'– মিছিলে উচ্চারিত এ স্লোগানের সূত্র ধরে ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের সিদ্ধান্তমাফিক তাদের হোস্টেল প্রাঙ্গণে রাতভর পরিশ্রমে শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ। আড়াই দিন স্থায়ী শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ মানুষের মুখে মুখে হয়ে ওঠে শহিদ মিনার, ঢাকাবাসীর প্রাণের মিনার। স্মৃতিস্তম্ভে নানা বয়সি নারী-

পুরুষের সার্বক্ষণিক শ্রদ্ধা নিবেদনের বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হতে পারে, এটি মিনার নয়, মাজার; যেখানে মানুষ ভক্তিতে মুক্তি খোঁজে।

শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য স্থায়ী প্রতীকী স্থাপত্য প্রতিষ্ঠা, যা মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর প্রেরণা জোগাবে। শহিদ মিনারে উপস্থিত মানুষের ঢল দেখে আতঙ্কিত সরকারের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর বিকেলেই সেটা ভেঙে ফেলে শেষ ইটের টুকরোটিও তুলে নিয়ে চলে যায়। তবু শহিদ মিনার মরেনি, জেগে থাকে মানুষের স্মৃতিতে। পরে তৈরি হয় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার, যা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে এখনো সেই প্রতিবাদী ঘটনার স্মৃতি বহন করে চলেছে। হয়ে উঠেছে সবরকম প্রতিবাদ প্রকাশের উৎস।

শুধু শহর ঢাকায় নয়, আন্দোলনের ধারায় তাৎক্ষণিক আবেগে এবং ১৯৫৩-র ফেব্রুয়ারি থেকে শহিদ দিবস পালনের সূত্রে সারা দেশের শহরে শহরে এবং শিক্ষায়তনগুলোতে (এমনকি গ্রামের স্কুলেও) তৈরি হয়েছে ছোটো-বড়ো নানা আকারের শহিদ মিনার, যা হয়ে ওঠে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও লড়াইয়ের প্রেরণা। শহিদ মিনার জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষারও প্রতীক। স্বভাবতই শহিদ মিনারের ইতিহাস লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ আমাদের জাতীয় কর্তব্য।

বুঝতে কষ্ট হয় না কেন ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সেনারা বাঙালি হত্যা তথা গণহত্যার সূচনালগ্নে ঢাকায় শহিদ মিনার ধ্বংস করেছিল। বাঙালি জাতীয়তার প্রতীকমাত্রই তাদের চোখে বিজাতীয় ও শত্রুস্বরূপ বিবেচিত হয়েছিল। সেসব ধ্বংস করা ছিল তাদের লক্ষ্য। শুধু ঢাকা শহরেই নয়, দেশের সর্বত্র আক্রমণ ও গণহত্যার পাশাপাশি শহিদ মিনারও ধ্বংস করেছে পাকিস্তানি সেনারা। ইতিহাস এমন তথ্যই দেয়।

শহিদ মিনার ও শহিদ দিবস (২১ ফেব্রুয়ারি) পালনের প্রভাব জাতীয় জীবনের প্রতিটি সংগ্রামে প্রেরণার উৎস হয়ে থেকেছে। এ প্রভাব মানুষের মন থেকে মুছে না যাবার মূল কারণ প্রতিবছর শহিদ দিবস পালন এবং বিশেষভাবে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের উপস্থিতি এ মিনার জাতির জন্য তার রাজনীতি এবং প্রধানত সংস্কৃতির পক্ষে হয়ে উঠেছে সবরকম প্রতিবাদের প্রতীক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিবাদী আন্দোলনের প্রেরণা।

তিন

একুশের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মতাদর্শগত পার্থক্য সত্ত্বেও সংগ্রামী চেতনার আপাত ঐক্য, সাময়িক ঐক্য। রংতুলি হাতে

চারুকলার ছাত্র, কারিগরি শিক্ষায়তনের ছাত্র, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের রোমান্টিক ছাত্র, অছাত্র ও তরুণ মিছিলে শামিল হয়েছে, কখনো নেতৃত্ব দিয়েছে বা অগ্রচারীর ভূমিকা পালন করেছে। করেছে ছাত্র, যুব ও তরুণ সবাই মিলে। আর সাধারণ মানুষ সেসব সভা-সমাবেশ ও মিছিলে অংশ নিয়েছে, ঘাতক অপশক্তির বিরুদ্ধে নির্ভয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

এভাবে একুশের ভাষার লড়াই নানামাত্রিক তৎপরতার মাধ্যমে স্বদেশচেতনার ভিত তৈরিতে সাহায্য করেছে। তারুণ্যের এই 'এস্টাবলিশমেন্ট' বিরোধী শক্তি এবং ব্যাপক জনসমর্থন একাত্ম হয়ে ১৯৫৩-৫৪ সালে স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ দলের পরাজয় ঘটিয়ে ২১ দফার ভিত্তিতে গণতন্ত্রী যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। পূর্ববাংলা থেকে উৎখাত করে সাম্প্রদায়িক লীগশাহির দৌরাত্ম্য। ভেঙে দেয় তাদের রাজনৈতিক অপশক্তির ভিত।

কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রে দুমাসও টিকতে পারেনি যুক্তফ্রন্ট সরকার। গণতান্ত্রিক ও সমাজবাদী ২১ দফার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষে। কেন্দ্রের অগণতান্ত্রিক তৎপরতায় পতন ঘটে এই সরকারের, জারি হয় ৯২-ক ধারাভিত্তিক আধা-সামরিক তথা গভর্নরি শাসন (৩০ মে, ১৯৫৪)। চলে ব্যাপক হারে গ্রেপ্তার ও নির্যাতন ছাত্র, যুবা ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের।

একুশের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব দেখা গেছে সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে চারিত্র্য ও গুণগত পরিবর্তনের বাঁক ফেরায়। একুশের চেতনা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী, লোকায়তিক ও প্রগতিবাদী ধারার বহুমাত্রিক বিকাশ ঘটায়। এ পরিবর্তনের প্রমাণ মেলে একুশ-পরবর্তী সাহিত্য সৃষ্টিতে ও সংস্কৃতিচর্চায়। বিশেষভাবে সাহিত্য সম্মেলনগুলোতে।

একুশে ফেব্রুয়ারি প্রতিবছর শহিদ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্কুল-কলেজ ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর তৎপরতায় ব্যাপক হারে স্মরণিকা ও সংকলন প্রকাশ পেতে থাকে। সেগুলো চরিত্রগত দিক থেকে প্রগতি-চেতনার ধারক। যেমন ১৯৫৩ সালে হাসান হাফিজুর রহমান-সম্পাদিত ও মোহাম্মদ সোলতান-প্রকাশিত সংকলন *একুশে ফেব্রুয়ারী*, যা সরকারি আদেশে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অথচ নিষিদ্ধ হওয়ার মতো রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কিছু তাতে ছিল না।

পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত হয় অনুরূপ আরো একাধিক সংকলন– যেমন ১৯৫৬-র ফেব্রুয়ারিতে ডিএ রশীদ ও মহিউদ্দিন আহমদ-সম্পাদিত সংকলন। ১৯৫৩ সালে লেখা হয় মুনীর চৌধুরীর একুশেভিত্তিক নাটক

কবর। এভাবে কবিতা, গান, গল্প, নাটক ইত্যাদি সৃষ্টিশীল ক্ষেত্রে নয়া আধুনিক সাহিত্যধারার জন্ম। সেইসঙ্গে উল্লেখ্য একই চরিত্রের সাহিত্য সম্মেলনগুলো। যেমন **১৯৫২**-র আগস্টে কুমিল্লায় বহুমুখী সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন। আরো ব্যাপকভাবে **১৯৫৪** সালে ঢাকায় কার্জন হলে, তিন বছর পর (১৯৫৭) ভাসানীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক চরিত্রের সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন। এ সবই একুশের অর্জন। কিন্তু একাধিক কারণে সামাজিক রক্ষণশীলতার ভিত ধ্বংস করার দিকে নজর দেওয়া সম্ভব হয়নি। যা ছিল ভাষা আন্দোলনভিত্তিক রাজনীতির দুর্বলতা।

চার

ভাষা আন্দোলনের তাৎক্ষণিক লক্ষ্য 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা'র অধিকার প্রথমে নামকাওয়াস্তে (১৯৫৬) এবং পরে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের ঘোষণায় অর্জিত হলেও এর তাৎপর্যপূর্ণ দাবিগুলো অর্জিত হয়নি। যেমন জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলার প্রতিষ্ঠা, উচ্চ শিক্ষা-বিজ্ঞান শিক্ষায় বাংলা মাধ্যমের ব্যবহার, আদালতে বাংলা প্রচলন এখনো অনেক দূরে রয়ে গেছে। স্বাধীন দেশে, ভাষিক রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদী চেতনার শাসকদের উপস্থিতিতেও একুশের এসব দাবি পূরণ হয়নি। জাতিরাষ্ট্র হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এখানে নিশ্চিতই তাত্ত্বিক অসম্পূর্ণতা। যেজন্য একুশ দফাও বাস্তবায়িত হয়নি। পরিবর্তে নতুন নতুন দফা এসেছে, গেছে।

বাংলাদেশের প্রধান জনগোষ্ঠী বাঙালির মাতৃভাষার অধিকার যেখানে অবহেলিত সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতির বিকাশে এদেশীয় শাসকগোষ্ঠীর যে কোনো চেষ্টা থাকবে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বভাবতই আদিবাসী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর তরফ থেকে উঠছে নানা অভিযোগ, দাবি উঠছে সাংবিধানিক স্বীকৃতির। এ দাবি সঠিক এবং যুক্তিসংগত, ন্যায়সংগত।

একুশকে ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে নেতিবাচক প্রকাশ এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। বায়ান্নর ধারাবাহিকতায় ঊনসত্তরের গণআন্দোলন ও একাত্তরের রণাঙ্গন পেরিয়ে আসার পরও স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে একুশের সর্বজনীন দাবি 'সর্বস্তরে বাংলা প্রচলন' যেমন বাস্তবায়িত হয়নি, তেমনি দেশের গণতান্ত্রিক শাসকশক্তির হাত দিয়ে সামাজিক পরিবর্তনও ঘটেনি। রক্ষণশীলতার সামাজিক ভিত নষ্ট করে শুদ্ধ আধুনিক চেতনার মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গড়ার চেষ্টা হয়নি।

একুশের ঘটনাবলির পর, এমনকি একাত্তরে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর উল্লিখিত সামাজিক পরিবর্তন ঘটানো হয়নি বলেই শুদ্ধ, গণতান্ত্রিক